কানাডা

রিফিউজি

জসিম মল্লিক - টরোন্টো

প্রায় সময়ই অনেক সহজ বিষয়ও মাথায় ঢোকেনা। হয়ত বিষয়টা নিয়ে তত মাথা ঘামাইনা বলে এমন হয়। জগতের অনেক ব্যাপারই বুঝতে পারিনা। আবার সবার জ্ঞানের পরিধি সমান নয়। আমি আমার নিজের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে জানি। অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আছে যে সম্পর্কে আমি ভীষণভাবে অজ্ঞ। সবাই যখন এসব বিষয় নিয়ে কথা বলে তখন আমি ক্যাবলাকান্তের মত শুনি। আবার ভাবি কত অল্প জেনেও তো মানুষের জীবন পার হয়ে যায়! যে বিষয়টা সম্মন্ধে জানি না সেটা নিয়ে কথা বলে লজ্জা পেতে কে চায়! সেজন্য অপেক্ষায় থাকি কেউ না কেউ না জানা বিষয় নিয়ে বলবেন। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় তার বিখ্যাত 'অর্ধেক জীবন' গ্রন্থে এক জায়গায় বলেছেন 'আমার চরিত্রের প্রধান দুর্বলতা এই যে, আমি নিজেকে জোর করে উপস্থাপিত করতে পারি না এবং প্রত্যাখান একেবারে সহ্য করতে পারি না। যেখানে প্রত্যাখানের সামান্য সম্ভাবনা থাকে সেখানে কিছু চাই না, সেখানে যাই না। এমনকী নিশ্চিত সম্মতির আভাস না পাওয়া পর্যন্ত আমি কোনও মেয়ের কাছেও চুম্বন প্রার্থনা করিনি। তা হলেও কি জীবনে কখনও আমাকে প্রত্যাখান সহ্য করতে হয়নি? হয়েছে অবশ্যই, অনেক সময় নিজের অনিচ্ছায় বা অন্যের তাড়নায় মানুষকে অনেক জায়গায় যেতে হয়, কিছু চাইতে হয়। সংস্কৃতে একটা কথা আছে, যাচঞ্ঞা মোঘা বরমধি গুনে নাধমে লব্ধকামা। অর্থাৎ, অধমদের কাছে কিছু চেয়ে লব্ধকাম হওয়ার বদলে গুনসম্পন্ন কারও কাছে কিছু চেয়ে ব্যর্থ হওয়াও ভালো। কিন্তু এ যুগে অধমদের হাতেই যে বেশি ক্ষমতা! এবং তারা কিছু দেবার আগে ক্ষমতা দেখাতে চায়।' আমি কোন ক্ষমতাবান লোক নই, তাই আমার কথা কেউ যেমন শুনবে না তেমনি আমি নিজেও ক্ষমতাবানদের কাছ থেকে দুরে থাকা শ্রেয় বলে জ্ঞান করি। বিদেশে আসার পর প্রায়ই রিফিউজি কথাটা শুনতে পাই।

রিফিউজি শব্দটির সাথে আমার প্রথম পরিচয় ছোটবেলায়। আমাদের বড়ির কাছেই সি এন্ড বি রোডের পাশে বেশ কিছু চারতলা বিল্ডিং ছিল। এগুলোকে বলা হতো **রিফিউজি কলোনী**। কেনো যে এই নাম হল আজও জানি না। সেখানে আমরা বিকেল হলে মাঝে মাঝে খেলতে যেতাম কারণ আমার বেশ কয়েকজন স্কুলের বন্ধু বাস করতো এই কলোনিতে। আর ছিল সুন্দর সুন্দর মেয়েরা। মেয়েদের দেখার জন্যও হয়তবা যেতাম। রিফিউজি যে আলাদা কিছু, তাদের যে আলাদা ধরণের দ:ুখ বেদনা আছে তখন তো তা মনে হয় নি! আমরা একত্রে খেলতাম, হাসতাম, বেড়াতাম। তারা তো কত সুখী ছিল দেখেছি। একথা ঠিক যে তারা কেউ স্থানীয় ছিল না। চাকরী সূত্রে তারা এসেছে। এটা ছিল আসলে সরকারী কলোনী। সরকারী কলোনীর নাম কেনো রিফিউজি কলোনী হবে? কেউ অন্য যায়গা থেকে এলেই বুঝি তাকে রিফিউজি বলতে হবে!

দেশ ভাগের পরে অনেক লোক ভারতে চলে যায়। তারা সেখানে ভাল জীবন পেলেও তাদের মধ্যে একটা দু:খবোধ ছিল। ভাবতো তারা কি রিফিউজি? সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় এ সম্পর্কে অনেকদিন পর বাংলাদেশে বেড়াতে এসে একবার লিখেছেন 'শীতকালে মেঘহীন নক্ষত্র খচিত আকাশ। ছায়াপথের অণু-পরমাণুর মতন আকৃতির সব তারা, যেমন ছোটবেলায় ছাদে শুয়ে দেখেছি। তখন মনে হত, এই বিশাল মহাকাশে আমাদের এই পৃথিবী নামের গ্রহটি একটা বালুকনার মতোও নয়। তার চেয়েও অতি ক্ষুদ্র। তারই মধ্যে

মানুষের সভ্যতা, সেই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র মানুষের কল্পনার জগৎ কত সীমাহীন, কালহীন, দিগন্তহীন? এই পৃথিবীরও অতি সংক্ষিপ্ত ইতিহাসে কত মানুষ দেশ থেকে দেশান্তরে গেছে, খাদ্য, পানীয় ও নিরাপত্তার সন্ধানে মানুষ জন্মস্থান ছেড়ে অজানার সন্ধানে যেতে দ্বিধা করেনি, পাড়ি দিয়েছে আপাতদৃষ্টিতে অকুল সমুদ্র। তা হলে আমার বাবা-কাকারা যে-কোনও কারণেই হোক ফরিদপুর ছেড়ে চলে গেছেন কলকাতায়, তা নিয়ে এত আদিখ্যেতা করারই বা কী আছে? মানুষ তো বাসস্থান বদলাতেই পারে। মাদারিপুরের সেই গ্রামের বাড়ির তুলনায় কলকাতায় আমরা তো তেমন খারাপ অবস্থায় নেই। প্রকৃতি থেকে বিচ্যুত হলেও যে নাগরিক উপভোগ পেয়েছি, তা কি কম আকর্ষনীয়? দেশ কি একটা ধোঁয়াটে আবেগময় ধারণা মাত্র নয়'!

আজকের প্রেক্ষাপটে হয়তবা সব কিছু বদলে গেছে। আমরা সবাইতো সেই অর্থে রিফিউজি! আমরা সবাই নিজের মাটি ছেড়ে কেউ পরবাসী কেউ অনাবাসী। এর মধ্যে আলাদা কিছু আছে কি! আমি কানাডার নাগরিক হলেও আমারইতো মাঝে মাঝে মনে হয় কিছু মৌলিক ব্যাপার ছাড়া সবইতো প্রায় এক! সুনীল গঙ্গোপধ্যায় লিখেছেন তার বাবার কথা 'এতদিন পর যেন তাঁর আবার মনে হল, তিনি পশ্চিমবাংলার নাগরিক নন, এখানে তো বাসা ভাড়া করে থাকা, তাঁর আসল বাড়ি পূর্ববঙ্গে। তিনি কোমায় শুয়ে বলতে লাগলেন, অনেকদিন বাড়ি যাওয়া হয়নি, এবার যেতে হবে, দরজার একটা কব্জা বদল করা দরকার ছিল, বাতাবি লেবু গাছটায় এক সময় অনেক ফল হয়, গোয়ালন্দ ঘাটের সেই হোটেলের খাওয়া তোর মনে আছে? স্টিমার হতে নেমে সেই হোটেলে খাব, তারপর নৌকোয় ধুয়াসার গ্রামের পাশ দিয়ে..কত শাপলা ফুল ফুটেছে, চুনিকে রিখে দিলে সে মাদারিপুরে থাকবে, এই মাসেই যাব... ।'

নিজের দেশ ছেড়ে কত দুরে আমরা বসবাসের জন্য এসেছি। মাঝে মাঝে মনে হয় কানাডা দেশটা বড় বেশী দুর। আর একটু কী কাছে হতে পারতো না! তাহলে একছুটে গিয়ে দেখে আসতে পারতাম মাকে, ভাই বোনদেরকে। আমার প্রায়ই এরকম হয় যে এক্ষুনি মার সঙ্গে কথা বলি, মাকে স্বপ্ন দেখেছি, উল্টো পাল্টা স্বপ্ন। মন খারাপ হয়ে যায় না! তখন কিছুতেই ফোনে পাইনা। কলিং কার্ডগুলোকে আপন মনে হয় না। তখন মনে হয় বরিশাল যায়গাটা বোধহয় এই গ্রহের নয়। হয়ত মাকে ফোনে পেলাম, আমি তার গলা শুনি কিন্তু তিনি কিছুতেই আমাকে শুনতে পান না। হয়ত মা বার্ধ্যক্যের কারণে ফোন সেটটা ঠিকমত কানে লাগাতে পারেন নি বা যে ফোন কার্ডটি ব্যবহার করছি সেটাই ভাল না। হয়ত বাড়ির ফোন সেটটা ঠিক নেই। একটা ফোন সেট বোধহয় কেনা দরকার। কত কথা মনে আসে।

এই যে বিদেশে যারা রিফিউজি তারা তো আমাদেরই ভাই বোন, বন্ধু, আত্মীয় পরিজনই। তাদের দঃুখ, বেদনা, অনুভুতিগুলো অনেক গভীর। দেশে আত্মীয় পরিজনের জন্য তাদের রয়েছে দীর্ঘ দিনের না দেখার হাহাকার! তাদেরকে কেনো আলাদা চোখে দেখতে হবে! তাদের দুর্বলতার সুযোগ কেনো আমরা নেই?। বরং আমাদের উচিত হবে যে মানুষটি সমস্যার মধ্যে আছে তার পাশে দাঁড়ানো। বিপদে বন্ধুর হাত বাড়িয়ে দেয়া। তারা এখানে এসেছে থাকার জন্য। কে কিভাবে এলো সেটা বড় ব্যাপার নয়। কার কি অবস্থান সেটা বড় করে দেখার চেয়েও তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসা দরকার। রিফিউজীদের মতো দু:খী বিদেশে আর নেই। তাদের কষ্টগুলো হৃদয় দিয়ে অনুভব করা দরকার। মানুষের প্রতি মানুষের ভালবাসা না থাকলে আমাদের বেঁচে থাকার আর কোন অবলম্বন থাকে না।

যারা রিফিউজি তাদের এমনিতেই সারাক্ষন একটা মানসিক যন্ত্রনা নিয়ে বাঁচতে হয়। কখন ডির্পোটেশনের আদেশ হবে তা তার জানা নেই। এই অবস্থায় তার দরকার মানসিক সাহায্য।

কামিউনিটির লিডারদের উচিত তাদের হয়ে সরকারের কাছে আবেদন জানানো । তাদেরও অনেকেই একসময় এই অবস্থা অতিক্রম করেছেন । তারা জানেন এর যন্ত্রনা কতটুকু । এক টুকরো কাগজের যে কত সুদুর প্রসারী আবেদন তা তারাই মাত্র জানেন যারা ভুক্তভোগী । দিনের পর দিন এই যন্ত্রনা নিয়ে বাঁচতে হয় । মানুষের স্বপ্নগুলো ভেঙ্গে যেনো না যায় এই প্রত্যাশা রইল ।

জসিম মল্লিক : অনাবাসী লেখক

টরন্টো

jasim.mallik@gmail.com